বিষ্ণুপুর ঘরানার সঙ্গীত : বিষ্ণুপুর থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যাত্রা

বিজয় হাঁসদা
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

এক

মানুষের সমস্ত জীবন সুরে জড়ানো। হাসিতে সুর থাকে, আবার গভীর কান্নাতেও সুর থাকে। এই সুরের জন্ম কোথায় হয়েছিল তার কোন ইয়াত্তা নেই। হয়তোবা এই সুরের জন্ম হয়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে কোন এক পাহাড়ের গুহার অন্ধকারে পাথরে পাথর ঘসে ঘসে আগুন প্রজ্জ্বলিত হতে হতে, প্রবাহিত ঝর্ণার শব্দে, পাখির কুহুকুজনে, কুয়াশার জাল ছিন্ন করে সূর্য জেগে ওঠার আনন্দে ঝিঁঝি পোকার ডাকে। সুর বয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তর। সুর কণ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রকাশিত হল যুগল নামে, সুর ও সঙ্গীত। এই সুর ও সঙ্গীতের ঢেউ এসে লাগল মল্লভূম বিষ্ণুপুরে। ঢেউ এসে থেমে গেল না, একেবারে স্বতন্ত্র একটি ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করল।

বিষ্ণুপুরের সুর ও সঙ্গীতের শেকড় প্রোথিত আছে কয়েক'শ বছর গভীরে। আদি মল্ল সিংহাসন আরোহণ (৬৯৪ খ্রীঃ/ ১ মল্লাব্দ) করার মধ্য দিয়ে মল্ল বংশের সূচনা করলেন। তখন বাঁকুড়ায় মল্ল রাজাদের রাজত্ব থাকার কারণে নাম হয়ে উঠল মল্লভূমি। আর মল্লদের রাজধানী হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুর। তারপর থেকে কয়েক পুরুষ মল্ল রাজারা শাসন করে গেছেন। মল্ল রাজাদের মধ্যে ৩৭ তম রাজা পৃথীমল্ল প্রবল সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতের চর্চাও শুরু হয় তার রাজত্বকালে কিন্তু তার মৃত্যুর পর সঙ্গীত চর্চায় ছেদ পড়ে যায়। পরে ৪২ তম রাজা শিবমল্ল সঙ্গীতকে আবারও পুনর্জীবিত করে তোলেন। সঙ্গীতের এই ধারাকে অব্যাহতি রেখেছেন ৪৯ তম অধিপতি বীরহাম্বির। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষিত হবার পর সঙ্গীতের প্রতি তীব্র আবেগ সৃষ্টি হয়। কথিত আছে বৃন্দাবন ধাম থেকে শ্রীজীব গোস্বামী গৌড় দেশে 'মনিমঞ্জুষা' নামক বাক্সে "হরিভক্তি বিলাস", "হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধু", "উজ্জ্বল নীলমণি", "ললিত মাধব", "বিদগ্ধ মাধব", "দানকেলী কৌমুদী" এবং সদ্য সমাপ্ত "চৈতন্যচরিতামৃত" এর পাণ্ডুলিপি সহ ১২১ খানি অমূল্য গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন। গুরু দায়িত্বে ছিলেন শ্রীনীবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ। কয়েকশো ক্রোশপথ অতিক্রম করার পর তারা মল্লভূমে উপস্থিত হয় :

এথা তো আচার্য ঠাকুর বনেতে ভ্রমিয়া

একদিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিঞা।

তবে রাস্তার মধ্যে গোপালপুর নামক গ্রামে দস্যুরা বৈষ্ণব গ্রন্থাদি লুঠ করেন। এমতবস্থায় উন্মাদের মতন তিনি আচার্য বীরহাম্বিরের সভায় উপস্থিত হন। মল্ল রাজের প্রচেষ্টায় সমগ্র বাক্সটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন বীরহাম্বির। অপর দিকে ওই সময় ভারতবর্ষে মোঘল কাল। আকবর-জাহাঙ্গীর-শাহজাহান তিনজনই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আমরা জানি মান সিংহের আমলে ধ্রুপদী গানের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও মোগল আমলেই ধ্রুপদী সঙ্গীতের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধনা হয়। কেন-না ওই সময় ধ্রুপদী সঙ্গীত ইসলামী গায়িকী ঢঙ বা এক বিশেষ ধরনের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে রাগ রাগিনীর বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ ধ্রুপদী সঙ্গীত চারটি নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উন্মোচিত হল। ধ্রুপদের চারটি বাণী হল—

(১) গৌড়হার বা গৌড়ী

(২) খান্ডার

(৩) ডাগুর বা ডাগর

(৪) নৌহার।

“তানসেন ছিলেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। সেজন্য তাঁর বাণীর নাম ছিল গৌড়ী অথবা, গৌড়হার বাণী। প্রসিদ্ধ বীণাবাদক সমোখন সিংহ তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করায় তাঁর নতুন নাম হয় নবাৎ খাঁ। নবাৎ খাঁ-র বাসস্থান ছিল খান্ডার। তাই তাঁর বাণীর নাম হয় খান্ডার বাণী। ব্রিজচন্দের বাসস্থানের নাম অনুযায়ী তার বাণীর নাম হয় ডাগুর বাণী। রাজপুত শ্রীচন্দ নৌহারের অধিবাসী ছিলেন, তাই তাঁর বাণীর নাম নোহার বাণী”।

“এই চার বাণীর মধ্যে গৌড়ী বাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রসাদগুণ। এই বাণী শান্তরসের উদ্দীপক। এর গতি ধীর। অন্যদিকে খান্ডার বাণী তীব্র রস উদ্দীপক। এর গতি খুব বিলম্বিত নয়। বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য প্রকাশই এর বিশেষত্ব। ডাগর বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সারল্য ও লালিত্য। এর গতি সহজ ও সরল। নোহার রীতি আশ্চর্য রসোদ্দীপক এবং এর গতি খানিকটা দ্রুত। এক সুদূর থেকে দু-তিনটি সুর অতিক্রম করে পরবর্তী সুরে যাওয়া এর বৈশিষ্ট্য”। সঙ্গীতের এই নতুন উদ্ভাবিত রীতি ভারতের সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে উন্মাদন সৃষ্টি করেছিল। তখন ওই সময় ঔরঙ্গজেব রাজত্ব করেছেন। তিনি সঙ্গীত চর্চা, শিক্ষা, উপাসনা উপর প্রতিবন্ধক আরোপ করেছিলেন। এটা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিস্তর বিতর্ক আলোচনা ও সমালোচনা চলে আসছে। প্রসিদ্ধ গায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস প্রথম খন্ড’ গ্রন্থে ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে বলেছেন-“ইনি একজন বিদ্বান্ ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার সময়ে সুজন খাঁ, জীবন দাস, প্রভৃতি গায়ক ছিলেন। অনেকের ধারণ ইহাঁর সময়ে বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ ইনি বহু পণ্ডিত ব্যক্তি দ্বারা "অলমগীর ফতও আ” নামক গ্রন্থ বাহির করেন যাহাকে "বিধান” বলে, ফতও আ অর্থে বিধান”। আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে শিক্ষা, সঙ্গীত চর্চা, ধর্ম উপাসনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে না গেলেও যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হয়েছিল।

মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬) সময়ে দিল্লীর ধ্বংস মুখে পতিত হয়। তখন দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়কগুণীরা দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়ে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। তানসেন-বংশধরেরা এলেন পূর্বদিকে, তাঁদের নাম হল 'পুরবীয়া'। তানসেনের শিষ্য-বংশীরেরা গেলেন রাজ-পুতনার দিকে, নাম হল 'পছাওয়ালা'। তানসেন-বংশধরদের কাশীর রাজা, অযোধ্যার নবাব, বেতিয়ার রাজা, রেওয়ার রাজা ও অন্যান্য অনেকে দরবারে আশ্রয় দিলেন। অন্য দিকে কলকাতা, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর, হুগলি, শ্রীরামপুর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় ওস্তাদদের আসা শুরু হয়। এই সময়েই বিষ্ণুপুরে আসেন বাহাদুর খাঁ নামে সঙ্গীতজ্ঞ এবং পীরবক্স নামে একজন পাখোয়াজী। তখন বিষ্ণুপুরের ৫৪ তম অধিপতি দ্বিতীয় রঘুনাথ রায়। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের কারণে বাহাদুর খাঁ কে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে এবং পীরবক্স কে নিজের সভা গায়ক রূপে অভিষিক্ত করেন। এবং তিনি ঘোষণা করেন “সুমধুর কণ্ঠবিশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে বাহাদুর খাঁর কাছে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করতে পারবেন। এমনকি দরিদ্র ছাত্রদের তিনি ভরণপোষণের ব্যবস্থা পর্যন্ত করবেন। তাই বহু ছাত্র তখন বাহাদুর খাঁর কাছে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করতে এসেছিল। আর রাজার নির্দেশে বাহাদুর খাঁ বহু ছাত্রকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন”। এই সময়কাল বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে সঙ্গীতের স্বর্ণযুগ। বাহাদুর খাঁ অনুরোধে রঘুনাথ রায় একটি সঙ্গীতের বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করা বাহাদুর খাঁ কে। খাঁ সেহেবের প্রধান শিষ্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, নিতাই নাজীর, বৃন্দাবন নাজীর। ওস্তাদের মৃত্যুর পর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তারপর থেকে বিষ্ণুপুর রাজদরবারেকে কেন্দ্র করে গুরু-শিষ্য পিতা-পুত্র বংশ পরম্পরায় সংগীত সাধনায় মগ্ন সঙ্গীতশিল্পীরা। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উৎকর্ষতা চরম সীমা স্পর্শ করে। সঙ্গীতের এই অভূতপূর্ণ উৎকর্ষতার জন্য বিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় দিল্লি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

সঙ্গীতের এই বৈচিত্রময়তার জন্য বিষ্ণুপুরে গাওয়া সঙ্গীতকে ‘বিষ্ণুপুর ঘরানা’ সঙ্গীত নামে পরিচিত লাভ করল। “এখন ঘরানা শব্দের অভিধানগত অর্থ সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের সঙ্গীতবৈশিষ্ট্য। সঙ্গীতের বিশিষ্ট ধারা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রবহমান এবং এই পদ্ধতি থেকে জন্ম নেয় নিজস্ব ঘরানা বা গানের প্রকাশবৈশিষ্ট্য বা স্টাইল। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সঙ্গীতের অনুশীলন ভারতীয় সঙ্গীত-ইতিহাসের মধ্য ও উত্তর যুগকে সমৃদ্ধিশালী করেছে”। সঙ্গীতধারার এক উজ্জ্বল ইতিহাস বাংলার বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে একসময় গড়ে উঠেছিল। ঘরানা সম্বন্ধে সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন সঙ্গীতজ্ঞ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়- “বিষ্ণুপুরের মতো স্বাধীন রাজ্যের রাজদরবারে নানা গায়কের উপস্থিতি ঘটতেই পারে এবং সেদিক থেকে এ কথা বলার অবকাশ আছে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে একাধিক ঘরানা এসে মিশেছিল। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতকে বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার গান, গাইবার ভঙ্গীকে বলি বিষ্ণুপুরী চাল। উত্তর ভারতের কোনো বিশেষ ঘরানা যদি বিষ্ণুপুরের উৎস হতো তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরানা না বলে সেনী ঘরানা বা অন্য কোনো ঘরানার নামেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের নামকরণ হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ, বিষ্ণুপুর-সঙ্গীত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা মনে করি, একাধিক ঘরানার সমন্বয়ই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে একটি নতুন রূপ দিতে সাহায্য করেছিল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সুনির্দিষ্ট ধারা নিতে পেরেছিল রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের আমল থেকে।......রামশঙ্করের সঙ্গীত

প্রতিভার যে পরিচয় পাই তাতে এ ধারণা দৃঢ় হয়ে ওঠে রামশঙ্করের কণ্ঠেই বিষ্ণুপুরী চালের উদ্ভব এবং বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে ঘরানাগত বিশেষত্ব সূচিত হয়েছিল”। বিষ্ণুপুর ঘরানার আদি সঙ্গীত গুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। চৈতন্য সিংহের সভা গায়ক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অবিশ্যি হলেও সত্যি যে পরিবারের কেউ গায়ক ছিলেন না, তা সত্ত্বেও বিরল প্রতিভার দাপটে গান গেয়ে মুগ্ধ করেছিলেন মল্লভূমবাসীকে। তাঁর রচিত দুটি গান উল্লেখ করা যেতে পারে :

১

কৃষ্ণ করুণাময় রাম হৃষীকেশ/বৃন্দা বিপিন পূর্ণচন্দ্র মথুরেশ।

মাধব মুকুন্দ মধু মথন যজ্ঞেশ/রাধিকা-রমণ রসরাজ নটবেশ।

নন্দ-সুত নীল-নলিনাভ ভুবনেশ/কেশী-মুর কংসহা যাদব মহেশ।

তব চরণকমল মতিবিহীন মূঢ়েশ/রামশঙ্কর সুদীনে কুরু কৃপালেশ।। (সরফর্দা-ঝাঁপতাল, ধ্রুপদ)

২

অশরণ-জনে-শরণদ ভব-সাগর-নাবিক গোবিন্দ।

করুণাময় কেশব কংসারি কালীয়-মর্দন

রাধা-বল্লভ রামকৃষ্ণ জগন্নাথ যোগেন্দ্র।

দীননাথ দুখ-বিমোচন দামোদর

দৈবকী-নন্দন মুরহর মধুসূদন মাধব মদনমোহন মুকুন্দ।

অঘ নিদাঘ যুতং পাপাত্মানং কুকর্মযুক্তং

রামশঙ্কর দীনং প্রতি দয়াং কুরু দেবেন্দ্র। (ভূপালি-ব্রহ্মতাল,ধ্রুপদ)

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নাড়াজোল নরেন্দ্রলাল খাঁ রাজ পরিবার সঙ্গীতাচার্যের পদ অলংকৃত করেছেন। এবং তিনি এক সময় কলকাতা মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক রূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি ‘সঙ্গীত মঞ্জুরী’ নামক মূল্যবানগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত দুটি গান উল্লেখ করা হল :

১

সব জগত লোগ জপত নিত শিব সুত গণপতকো

ঋদ্ধি সিদ্ধি দাতা বিজ্জন হরণ।

খরব পীবর তন নেক গজ বদন

অরুণ কিরণ জিন জাকো বরণ।

গণেশ গণনায়ক ঔর এক বদন

পূজত নিশ দিন ইন্দ্রচন্দ্রতপন।

দেব অরচিত চরণ কৈসে পাবে প্রসন্ন

একসময় পুরো কলকাতা মল্লভূমির গায়কদের সুরের মুর্ছনায় মুর্ছিত হত। তখন কলকাতায় রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে ব্রহ্মসভার জন্য আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করলেন। শাস্ত্র পাঠ, ধর্ম, সাহিত্য শিল্প, আলোচনা হল মূল উদ্দেশ্য। ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ হিসেবে তিনিই প্রথম ধর্মসঙ্গীতকে সংযুক্ত করেন। ধ্রুব পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি গান রচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর ৪৪টি গান নিয়ে 'ব্রহ্মস্মসঙ্গীত' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই কলকাতার বিভিন্ন রাজসভাতে মল্লভূমির শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হত। রামকেশব ভট্টাচার্য কোচবিহার রাজা সতুবাবুর সভাগায়ক ছিলেন, গঙ্গনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, কেশবলাল চক্রবর্তী কলকাতার রাজা তারকনাথ প্রামানিকের রাজসভা অলংকৃত করেছেন। সঙ্গীতজ্ঞ গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন যদু ভট্টের গান কর্ণগোচর হয়। আবিষ্কার করেছিলেন অপার ঐশ্বর্যের সঙ্গীতের জগৎ। বেশ কিছুদিন পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যদু ভট্টর গানে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত শিক্ষক রূপে যদু ভট্টকে ঠাকুর বাড়িতে অভিষিক্ত করেন। একে একে বিষ্ণু চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্রীকণ্ঠবাবু ও ঠাকুর বাড়ির সঙ্গীত শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ খুব বেশিদিন না হলেও বাল্যকালে বিষ্ণুর চক্রবর্তীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নিয়ে ছিলেন। প্রত্যেক রবিবার বিষ্ণু চক্রবর্তী বাড়িতে আসতেন গান শেখাতে। রবীন্দ্রনাথ তার সম্পর্কে বলেছেন : "বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখি নি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গাঁনের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সংগীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন"। অপর একটি অংশে তিনি বলছেন-"বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই পাঠশালায় আমাকেও ভর্তি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলায়। দুই-একটা নমুনা দিই-

এক-যে ছিল বেদের মেয়ে-এল পাড়াতে

সাধের উল্কি পরাতে।

আবার উল্কি-পরা যেমন-তেমন,

লাগিয়ে দিল ভেল্কি-

ঠাকুরঝি!

উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি

ঠাকুরঝি!

আরও কিছু ছেঁড়া-ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন-

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি।

মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফার্সি পড়ে তাঁতি।

গণেশের মা, তার কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,

একটি মোচা ফললে পরে

কত হবে ছানাপোনা"।

বিষ্ণু চক্রবর্তী সম্পর্কে সঙ্গীতজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন "অন্যান্য ওস্তাদের গানের চেয়ে বিষ্ণুর গানই সকলে বেশি পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদরা যেমন তান-অলঙ্কারে প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমনি কিছু করিতেন না। তিনি অল্পস্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন না। ইহা ছাড়া, কথার যে একটা

মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ-খেয়ালই বেশি গাহিতেন।”

রবীন্দ্রনাথ বরং শ্রীকন্ঠবাবুর গান শিখতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ শ্রীকন্ঠবাবু গান শেখাতেন না, গানের সুর দিতেন। আর সেই সুর গুনগুন করতে কখন যে গানে রূপান্তরিত হত রবীন্দ্রনাথ টেরই পেতেন না। সঙ্গীত গুরু রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন হিন্দুস্তানি সংগীতের অনুকরণে ধ্রুপদী গান রচনার তালিম নিয়ে ছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথকে সবথেকে বেশি প্রভাবিত করেছিল যদু ভট্টের গান। কিন্তু তিনি যদু ভট্টের থেকে বেশি গান শিখতে পারেননি। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “তার পরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই- সেই জন্যে গান শেখাই হল না”। যদু ভট্ট যে শুধু ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের গান শেখাতেন এমন নয়। গান শেখানোর সময় বাড়ির বাইরের কেউ এলে এবং তার আগ্রহ থাকলে তাকেও সমান ভাবে গান শেখাতেন। অর্থাৎ যাদু ভট্ট গায়ক হিসেব যেমন অসামান্য ছিলেন তেমনি মানুষ হিসেবে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর গায়িকী ঢঙ বারবার আপ্লুত করেছে রবীন্দ্রনাথকে। যদু ভট্টের আপার সঙ্গীতের জ্ঞানের জন্য মুক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : “ছোটোবেলায় আমার গলা খুব ভালো ছিল। সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট- অত বড়ো গাইয়ে বংলায় আজ পর্যন্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ- আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন”। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীত জীবনে যদু ভট্টের হিন্দি-খেয়াল-টপ্পা-ধ্রুপদী গানের অনুসরণে অনেকগুলি ভাঙা গান রচনা করেছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' শীর্ষক গ্রন্থে যদুভট্টের গান এবং রবীন্দ্রনাথের গানকে সাজিয়ে এক সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। গানের তালিকা প্রস্তুত করা হল :

রবীন্দ্র-গীত	**পুরোবর্তী আদর্শ**	**রাগ-তাল**	**প্রাপ্তিস্থান**
অন্তরে জাগিছ	কোন যোগী ভয়ো	বেহাগ, ঝাঁপতাল	ইন্দিরা
অমৃতের সাগরে	মৈ তো না জাঁউ	কামোদ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
অশ্রুভরা বেদনা	তনমনধন ভূয় পরবারে	মিশ্র কাফি, ত্রিতাল	
অসীম আকাশে অগণ্য	সকল গুণ প্রকাশ	মারুকেদারা, চৌতাল	গীতসূত্রসার
অসীম কালসাগরে	সারদা বিদ্যাদেনী	ভৈরবী, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
অহো! আস্পর্ধা একি	দারা দ্রিম তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল	
আইল আজি প্রাণসখা	খোল অব ঘুঘট পট	কেদারা, আড়াঠেকা	
আইল শান্তসন্ধ্যা	ভাওয়েরে ভস্ম	শ্রীরাগ, চৌতাল	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
আঁখিজল মুছাইলে	জিন ছুঁয়ো মোরে	রামকেলি, ত্রিতাল	ইন্দিরা
আছ অন্তরে চিরদিন	কৈসে অব ধরো ধীর	কাফি, চৌতাল	
আজ বুঝি আইল প্রিয়তম	ফুল রহি কলিয়া মধুবন	সাহানা, ত্রিতাল	গীতসূত্রসার
আজি এ আনন্দসন্ধ্যা	বহুর বজাও বংশী	পূরবী, তেওরা	গীতপ্রবেশিকা
আজি কমলমুকুলদল	মনকী কমলদল	মিশ্রবাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
আজি নাহি নাহি নিদ্রা (?)		মিশ্র সিন্ধু। ত্রিতাল	
আজি বহিছে বসন্তপবন	আজু বহত সুগন্ধ পবন	বাহার, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মম জীবনে নামিছে	অব মোরি পায়েলা বাজমু	আড়ানা, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মম মন চাহে	ফুলি বন ঘন মোর	বাহার, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি মোর দ্বারে	হো হো মোরে দ্বার	দেশ, পঞ্চমসওয়ারি	ইন্দিরা
আজি শুভদিনে	পূর্ণ চন্দ্রাননে (কানাড়ী)	খাম্বাজ। তাল-ফেরতা	
আজি রাজ-আসনে	প্যারি তেরে পায়ন পকরু	বেহাগ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
আজি হেরি সংসার অমৃতময়	এরি পরমেশ্বর	বেলাবলী, চৌতাল	
আনন্দ তুমি স্বামী	ওঙ্কার মহাদেব	ভৈরবী, সুরফাঁকতাল	
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মালকোষ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে	(মহীশূরী)	ভজন, একতালা	
আনন্দ রয়েছে জাগি	আজু' রচো করতার	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা

আমারে করো জীবন দান	ইয়া জগ ঝুট	শঙ্করা, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
আমি দীন অতি দীন		রামকেলি, ঝাঁপতাল	
আয় লো সজনি সবে	আজু মোরন বন	মল্লার, কাওয়ালি	শতগান
উঠি চল সুদিন আইল	উঠি চলে সুদিন নাচত	কেদারা, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
এই-যে হেরি গো দেবী	মনকী কমলদল খোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি	(গুজরাটী)	ভজন, একতালা	
একি এ সুন্দর শোভা	বাজু রে মন্দর বাজু	ইমনভূপালি, ত্রিতাল	কণ্ঠকৌমুদী
একি করুণা করুণাময়	নইরে মা বরণ	বাহার, আড়াঠেকা	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ	(মহীশূরী)		
একি হরষ হেরি কাননে	মন্ত্রী কমলদল খোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
এখনো তারে চোখে দেখি নি	পায়েলিয়া মোরে বাজে	ইমন, কাওয়ালি	ইন্দিরা
এত আনন্দধ্বনি উঠিল	আজু ব্রজমেঁ	বাহার, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
এ পরবাসে রবে কে হায়	ও মিঞা বেজনুওয়ালে	সিন্ধু, মধ্যমান	
এ ভারতে রাখো	এ বতিয়াঁ মেরো	সুরট, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
এ হরি সুন্দর	এ হরি সুন্দর (পাঞ্জাবী)	আরতি গান, কার্ফা	
এ মোহ-আবরণ খুলে দাও	ঘুঁঘট পট খোলি	ইমন, আড়াঠেকা	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
এই বেলা সবে মিলে	চতুরঙ্গ রস সন	ইমন কল্যাণ,ত্রিতাল(দ্রুত)	সঙ্গীতমঞ্জরী
এসো শরতের অমল মহিমা	বাজে ঝনন ঝনন বাজে	জৌনপুরী, ত্রিতাল	
এসেছে সকলে কত আশে	বুঁদ পৰন পুৰাই	হাম্বীর, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
ওই পোহাইল তিমির-রাতি	তোম্ তানা নানা নানা	আলাইয়া, ত্রিতাল	কণ্ঠকৌমুদী
ও কী কথা বল সখি		দেশখাম্বাজ, ত্রিতাল	
ও কেন ভালোবাসা	কৌন পরদেশ	পিলু, খেমটা	
ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও	গর্ য়ার্ নহো সাকি	মিশ্রসুরট, দাদ্‌রা	ইন্দিরা
ওঠো ওঠো রে-বিফলে		বিভাস, চৌতাল	
ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে	এরিমা সব বন অমুয়া	পরজ-বাহার, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত
কাছে তার যাই যদি		জয়জয়ন্তী, কাহারবা	
কামনা করি একান্তে	প্রথম কর শিঙ্গার মোরে	দেশকার, চৌতাল	
কার বাঁশি নিশিভোরে	কান ভনকবা	গান্ধারী, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত
কার মিলন চাও বিরহী	তনু মিলন দে পরবর	শ্রীরাগ, তেওরা	আনন্দসঙ্গীত কণ্ঠকৌমুদী
কী করিলি মোহের ছলনে	অবদিন থোড়ি রহি	ভজন, ঠুংরি	সঙ্গীতপ্রকাশিকা
কী ভয় অভয়ধামে	নিডর ডর নিমাই	বেহাগ, ঝাঁপতালত	গীতসূত্রসার
কে বসিলে আজি	বে পরিয়া তাঁড়ে	সিন্ধু, মধ্যমান	সঙ্গীতবিজ্ঞান
কেমনে ফিরিয়ে যাও	বাবরে কি সঙ্গসাথ	ভৈরবী, চৌতাল	ইন্দিরা
কে রে ওই ডাকিছে	তারি ডফ বাজত	আলাইয়া, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
কোথা আছ প্রভু	(গুজরাটী)	ভজন, একতালাও	
কোথা ছিলি সজনি লো		ভৈরবী, ত্রিতাল	
কোথা যে উধাও হল	বোল রে পাপিয়ারা	মিঞামল্লার, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে
কোথা হতে বাজে		সুরট, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
খেলার সাথি বিদায়দ্বার খোলো	মহারাজা কেবড়িয়া		
গগনের থালে রবিচন্দ্র	গগনোমে থাল (পাঞ্জাবী)		
গহন ঘন ছাইল	ইন্দহুঁকী অসবরী	গৌড়মল্লার, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
গহন ঘন বনে	সঘন ঘন বঙ্ক	হাম্বীর, চৌতাল	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
ঘোরা রজনী এ	বাজে ঝননন মোরে পায়েলিয়া	কানাড়া, ত্রিতাল	ইন্দিরা

চরণধ্বনি শুনি	মুরলীধুনি শুনি	সিন্ধু, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
চরাচর সকলি মিছে মায়া	দারা দ্রিম্ তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল	
চিরদিবস নব মাধুরী	নব ভবন নব রাঘব	নটমল্লার, চৌতাল	গীতসূত্রসার
জগতে তুমি রাজা	অচল বিরাজ	কানাড়া, চৌতাল	
জননী, তোমার করুণ চরণখানি		মিশ্র গুণকেলী নবপঞ্চতালং	
জর জর প্রাণে নাথ	অব তেরি বাঁকিবাঁকি চিত	সিন্ধুড়া, ত্রিতাল	ইন্দিরা
জয় তব বিচিত্র আনন্দ	জয় প্রবল বেগবতী	বৃন্দাবনীসারঙ্গ, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
জয় রাজরাজেশ্বর		ভূপালী, তালফের্তা	
জাগ জাগ রে জাগ	প্রথম পরবর দিগারহি	তিলককামোদ, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে	আজু রঙ্গ খেলত হোরি	বেহাগ, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে	উচি চিত বন	বিভাসং চৌতাল	গীতসূত্রসার
ডাকি তোমারে কাতরে	তুঁহি ভজ ভজ রে	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	
ডাকিছ কে তুমি	হাঁরে ডফ বাজন	খাম্বাজ, ধামার	
ডাকে বার বার ডাকে	মোহে কৈসে নিকি লাগি	কেদারা, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ডুবি অমৃতপাথারে		ললিত, চৌতাল	
তব অমল পরশরস	তুয়া চরণ কমল'পর	আশাবরী, ত্রিতাল	গীতপ্রবেশিকা
তব প্রেমসুধারসে মেতেছি	কারি কারি কমরিয়া গুরজী	পরজ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
তবে কি ফিরিব সখা		দেশীটোড়ী, টিমাতেতালাও	
তাঁহার প্রেমে কে ডুবে		ভৈঁরো, একতালা	
তাঁহারে আরতি করে	জগজন ধ্যান ধরত	বড়হংসসারঙ্গ, চৌতাল	
তিমিরবিভাবরী কাটে	ক্যায়সে কাটোঙ্গি	বেহাগ, ত্রিতাল	ইন্দিরা
তিমিরময় নিবিড় নিশা	প্রবল দল মেঘ	মেঘ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
তুমি আপনি জাগাও মোরে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈঁরো, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে
তুমি কিছু দিয়ে যাও	কৈ কছু কহরে	খাম্বাজ, কাহারবা	
তুমি জাগিছ কে	তুম নয়ন মে	গোঁড়, চৌতাল	গীতসূত্রসার
তোমা লাগি নাথ	তুম বিন রহো	পূরবী, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
তোমা-হীন কাটে দিবস	তুম বিন কৈসে	বাগেশ্রী, আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
তোমার দেখা পাব বলে	কর কঙ্গনওয়া	মল্লার, ত্রিতাল	আনন্দসঙ্গীত
তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ	মেরে গিরিধর গোপাল	ভৈরবী, একতালা	
তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে	আজ শ্যাম মোহলিয়ে	খাম্বাজ, একতালা	গীতপরিচয়
তোমারি মধুর রূপে	তেরো হি নয়নবাণ	ঝিঁঝিট, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
তোমায় যতনে রাখিব হে		দেশখাম্বাজ, ঝাঁপতাল	
দাও হে হৃদয় ভরে দাও	প্যালা মুঝে ভরি দেরে	রামকেলি, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
দাঁড়াও মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড	এরি অব আনন্দ	ভীমপলাশী, সুরফাঁক	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
দিন যায় রে দিন	বেণিজা রয়ননদ	পিলু, মধ্যমান	
দুঃখরাতে হে নাথ	রঙ্গরাতি মাতিয়া	সরফর্দা, আড়াঠেকা	সঙ্গীতমঞ্জরী
দুখ দূর করিলে	বাজত বীণ	রামকেলী, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
দুয়ারে বসে আছি প্রভু	মৈতো ন জাঁউ	কামোদ, ধামার	
দেখা যদি দিলে	পিয়া বিন কৈসে	বেলাবলী, ত্রিতাল	
দেবাধিদেব মহাদেব	দেবন দেব মহাদেব	দেওগিরি, সুরফাঁক	গীতসূত্রসার
নব আনন্দে জাগো আজি	অধর ধরে বনবাঁশরী	টোড়ি, ত্রিতাল	
নব নব পল্লবরাজি	মনমথ তন দহে	বাহার, চৌতাল	
নমি নমি ভারতী	(গুজরাটা)	প্রভাতী, ঝাঁপতালত	

নয়ান ভাসিল জলে	পাপিহা বোলে রে	শ্যাম, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
নাথ হে প্রেমপথে	বলমা রে চুনরিয়া	সুহাকানাড়া, ত্রিতাল	
নিকটে দেখিব তোমারে	আনু আইল ভোর কি	রামকেলি, ত্রিতাল	
নিত্য নব সত্য তব	জ্ঞানরঙ্গ ধ্যানরঙ্গ	শুক্লবিলাবল, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
নিত্য সত্যে চিন্তন	কালী নাম চিন্তন	আড়ানা, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
নিশিদিন চাহ রে	আজু মনভাবন যোগি আয়ে	যোগিয়া, আড়াঠেকা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
নিশিদিন মোর পরানে	উন সন জায় কাহোরি	গান্ধারী, ত্রিতাল	
নীলাঞ্জনছায়া	বৃন্দাবন লোলা (দক্ষিণী)		
নূতন প্রাণ দাও	সোতন মদ মাত	নাচারীটোড়ি, ধামার	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
পান্থ এখন কেন অলসিত	রঙ্গ যুগত সোঁ গাবে বজাবে	ললিত, সুরফাঁক্তা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
পিপাসা হায় নাহি মিটিল	সাঁইয়া জাঁউ জাঁউ নাহি বোলেঙ্গি	ভৈরবী, ত্রিতাল	
পূর্ণ আনন্দ	পূর্ণ ব্রহ্ম	কল্যাণ, চৌতাল	
পেয়েছি অভয়পদ	ঈশ্বরী নাম জপ	খট, ঝাঁপতাল	গীতসূত্রসার
পেয়েছি সন্ধান তব		গৌড়সারং, চৌতাল	
প্রচণ্ড গর্জনে	প্রচণ্ড গর্জন	ভূপালী, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
প্রথম আদি তব শক্তি	প্রথম আদ শিব শক্তি	সোহিনী, সুরফাঁকতাল	গীতসূত্রসার
প্রভাতে বিমল আনন্দে	নাদনগর বসায়ে	গুর্জরীটোড়ি, চৌতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
ফিরায়ো না মুখখানি	কহো ন ঐসী বাত	হাম্বীর, ত্রিতাল	
বড়ো আশা করে	সখি বা বা (কানাড়ী)	ঝিঁঝিট, কাওয়ালিঃ	
বন্ধু, রহো রহো সাথে	সঙ্গে চলা, দিয়া, হাওয়ে	ভৈরবী, কার্ফা	
বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ	দুসহ দোখ-দুখ দলনী	নিশাসাগ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাজাও তুমি কবি	আয়ে ঋতুপতি	বাহার, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাজে করুণ সুরে	নিতু চরণ মূলে (দক্ষিণী)		
বাজে বাজে রম্যবীণা	বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ (পাঞ্জাবী)	ইমনকল্যাণ, তেওরা	
বাণী তব ধায় অনন্ত	বেণী নিরখত ভুজঙ্গ	আড়ানা, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী	মীনাক্ষী মে মুদম (দক্ষিণী)		
বিদায় করেছ যারে	বাজে ঝননন মোরে পায়লিয়া	কানাড়া, ঝাঁপতাল	ইন্দিরা
বিপুল তরঙ্গ রে	নাচত ত্রিভঙ্গ য়ে	ভীমপলশ্রী, তেওরা	সঙ্গীতমঞ্জরী
বিমল আনন্দে জাগ রে	সো নহি মারেঙ্গে মোরি রে	গান্ধারী, ত্রিতাল	
বিশ্ববীণারবে	নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস	শঙ্করাভরণ, তাল-ফেরতা	ইন্দিরা
বীণা বাজাও হে	বীণ বাজায় রে	পূরবী, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
বেদনা কী ভাষায় রে	(দক্ষিণী)		
বেঁধেছ প্রেমের পাশে	চাঁচর চিকুর আধো (বাংলা)	কাফি-কানাড়া,ঢিমাতেতালা	গীতপ্রবেশিকা
ব্যাকুল প্রাণ কোথা	ব্যাহণ লিয়ে বন	ভূপালি, মধ্যমান	
ভক্তহৃদিবিকাশ	শম্ভু হর মহেশ	ছায়ানট, সুরফাকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
ভবকোলাহল ছাড়িয়ে	কাহ্ন ন কর মোসে	দরবারী টোড়ি, ঢিমাতেতালা	
ভাসিয়ে দে তরী		জয়জয়ন্তী, কাওয়ালিঃ	
মধুররূপে বিরাজো	কৌনরূপ বনে হো	তিলককামোদ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
মন জাগো মঙ্গললোকে	জাগো মোহন প্যারে	ভৈরোঁ, ত্রিতাল	ভাতখণ্ডে
মন জানে মনোমোহন	মন মানো	নট, চৌতাল	গীতসূত্রসার
মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে	হস হস গরওয়া লগাবে	ভৈরবী, যৎ	রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
মন্দিরে মম কে	সুন্দর লাগি রহে	আড়ানা, একতালা	সঙ্গীতচন্দ্রিকা

মম অঙ্গনে স্বামী	আজু ব্রজমে সেঁইয়া	বাহার, ধামার	সঙ্গীতমঞ্জরী
মহাবিশ্বে মহাকাশে	মহাদেব মহেশ্বর	ইমনকল্যাণ, তেওরা	জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপি
মহারাজ একি সাজে	মেরে দুন্দ দল সাজে	বেহাগ, ঝাঁপতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
মোরে বারে বারে ফিরালে	মোরি নয়ি লগন লাগি রে	নটমল্লার, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
যাওয়া-আসারই এই কি খেলা	প্রেম ডগরিয়াঁমে ন করো	গান্ধারী, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
যাও রে অনন্তধামে	গুজরাটী)	প্রভাতী, ঝাঁপতাল	
রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে	মুরলিয়া ইহ ন বজাও শ্যাম	খাম্বাজ, ত্রিতাল	
রাখো রাখো রে জীবনে	জান না দোঙ্গি এরি মা	শ্যাম, ত্রিতাল	সঙ্গীতচন্দ্রিকা
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	মল্লার, ত্রিতাল	
শক্তিরূপ হেরো তাঁর	সপ্তসুর তিনগ্রাম	ইমন, চৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
শান্তি কর বরিষণ	শম্ভু হর পদযুগ	তিলককামোদ, সুরফাঁক্তা	সঙ্গীতমঞ্জরী
শান্তিসমুদ্র তুমি	হো নর হর	টোড়ি, টিমাতেতালা	
শীতল তব পদছায়া	বাঙ্গুরী মোরী	ইমনকল্যাণ, একতালা	সঙ্গীতমঞ্জরী
শুভ্র আসনে বিরাজ	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন	ভৈঁরো, আড়াচৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
শূন্য প্রাণ কাঁদে		সিন্ধু, একতালা	
শূন্য হাতে ফিরি হে	রুমঝুম বরখে	কাফি, সুরফাঁকতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
শোন তাঁর সুধাবাণী	শুধমুদ্রা শুধবাণী	ইমনকল্যাণ, চৌতাল	কণ্ঠকৌমুদী
শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ		পূরবী, ত্রিতাল	
সকাতরে ওই কাঁদিছে	চারি বর্ষা পর্যন্ত (কানাড়ী)	ভজন, একতালা	
সখা, সাধিতে সাধাতে	সখি তরসে তরসে	মিশ্র, খেমটা	
সখি, আঁধারে একেলা ঘরে	সখি, আওত আঁধেরী ঘটা		
সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	দুষ্ট দুর্জন দূর করো দেবী	ইমনকল্যাণ, তেওরা	গীতসূত্রসার
সবে আনন্দ করো	সুখ আনন্দ করো	দেওগিরি-বেলাবলী, আড়াচৌতাল	গীতসূত্রসার
সবে মিলি গাও রে	সব মিল গাও	হেমখেম, চৌতাল	গীতসূত্রসার
সংশয়তিমির-মাঝে	অজ্ঞানতমনি করে	দেশসিন্ধু, কাওয়ালি	কণ্ঠকৌমুদী
সংসারে কোনো ভয় নাহি	শ্যামকো দরশন নহি	ইমনকল্যাণ, আড়াচৌতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী
সাজাব তোমারে হে	ভুলিসি গোবারণ	নট্‌কিন্দ্র, ধামার	গীতসূত্রসার
সুখহীন নিশিদিন পরাধীন	দারাদীম দারাদীম	নটমল্লার, ত্রিতাল	সঙ্গীতমঞ্জরী

যদু ভট্ট বঙ্কিমচন্দ্রকেও একসময় গান শিখিয়ে ছিলেন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের সুরও তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন। তবে তিনি কোন রাগে গানটি গেয়ে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন : "যদুভট্ট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' গানটির সুর করেন কাফি রাগে ত্রিতালের উপর।" অর্থাৎ লক্ষ্য করা যায় বিষ্ণুপুরের গায়করা শুধু যে ঠাকুর পরিবারেই গান গেয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, গোটা কলকাতা জুড়েই তাঁদের জুড়ি মেলা ভার ছিল। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ভারতীয় উচ্ছাঙ্গ সংগীতের স্বরলিপি প্রথম তৈরি করলেন। ফলে বিষ্ণুপুরের গায়কদের সঙ্গীতের সুভাষ ছড়িয়ে পড়েছিল সীমানা থেকে সীমান্তের। সঙ্গত কারণেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : "অন্য বিষয়ে বিষ্ণুপুরের গৌরব অস্তমিত হইলেও, শিল্প ও সংগীতে তাহা কথঞ্চিৎ সংরক্ষিত আছে। বিশেষতঃ সঙ্গীত বিষয়ে বিষ্ণুপুর এখনো ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান স্থান।"

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১ মল্লভূম বিষ্ণুপুর-মনোরঞ্জন চন্দ্র

২ বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা-রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

৩ পশ্চিমবঙ্গ বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা ১৪০৯

৪ বাঁকুড়া পরিক্রমা- অনুকূল চন্দ্র সেন

৫ বাঁকুড়া জেলার বিবরণ-রামানুজ কর

৬ গল্প কথায় বিষ্ণুপুর-শ্রী অনিলবরণ কর

৭ বাঁকুড়া পরিচয়-অমিয় পাত্র

৮ বিচিত্রা পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, প্রথম খন্ড শ্রাবণ ১৩৪১—পৌষ ১৩৪১

৯ পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি- বিনয় ঘোষ

১০ পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪১০

১১ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস প্রথম খণ্ড- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

১২ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে উৎপত্তি ও ক্রমিকাশের ধারা—উৎপল গোস্বামী

১৩ বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী- শ্রীফকিরনারায়ণ কর্মকার

১৪ সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

১৪ সঙ্গীতের শিল্পদর্শন- ডঃ অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস প্রথম খণ্ড- শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬ রবীন্দ্র সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন-ডঃ দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার

১৭ রবীন্দ্রসংগীত- শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

১৮ রবীন্দ্রসঙ্গীতেরসুষমা- কিরণশশী দে

১৯ সংগীতচন্দ্রিকা- শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯ গীতবিতান- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০ রবীন্দ্র সংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা প্রথম তৃতীয় খণ্ড- শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

২১ সংগীত-চিন্তা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২ সংগীত পরিক্রমা- নারায়ণ চৌধুরী

২৩   বিষ্ণুপুরের পাঁচ কিংবদন্তি সংগীত সাধক-লীলাময় মুখোপাধ্যায়